কোকিল

হান্স ক্রিশ্চিয়ান আন্দেরসেন

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

শোনো তবে—

চীনদেশের রাজা একজন চীনেম্যান, তাঁর আগে-পিছে ডাইনে-বাঁয়ে যত লোক, তারাও সব চীনে। রাজার ছিল এক প্রাসাদ, অমন আর পৃথিবীতে হয় না। বাগানে ফোটে কত আশ্চর্য ফুল; সবচেয়ে যেগুলো দামি তাদের গলায় রুপোর ঘণ্টা বাঁধা, কাছ দিয়ে যদি হেঁটে যাও, ঘণ্টার শব্দে ফিরে তাকাতেই হবে। বুঝলে, রাজার বাগানে সব ব্যবস্থাই চমৎকার। এত বড়ো বাগান, মালি নিজেই জানে না তার শেষ কোথায়। যদি কেবলই হেঁটে চলো, আসবে এক বনের ধারে। কী সুন্দর বন, তাতে মস্ত উঁচু গাছ আর গভীর হ্রদ। বন সোজা সমুদ্রে চলে গেছে, নীল জলের অতল সমুদ্র আর ঝুঁকে-পড়া ডালপালার আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক কোকিল। কী মধুর তার গান, এত মধুর যে জেলে মাছ ধরতে এসে হাতের কাজ ফেলে চুপ করে শোনে, যখন শেষ রাতে জাল ফেলতে আসে সে শোনে কোকিলের স্বর।

নানা দেশ থেকে নানা লোক আসে সেই রাজধানীতে, দেখে বাহবা দেয়। রাজার প্রাসাদ আর বাগান দেখে তাদের চোখের পলক আর পড়ে না; কিন্তু কোকিলের গান যেই তারা শোনে, অমনি বলে ওঠে, 'আহা, এমন আর হয় না!' দেশে ফিরে এসে তারা কোকিলের গল্প করে; পণ্ডিতেরা বড়ো-বড়ো পুথি লেখেন চীন রাজার প্রাসাদ নিয়ে, বাগান নিয়ে; কিন্তু কোকিলকে কি তাঁরা ভুলতে পারেন? সেই পাখির প্রশংসা হাজার পাতা জুড়ে, আর কবিরা হ্রদে-ঘেরা বনের বুকের সেই আশ্চর্য পাখিকে নিয়ে আশ্চর্য সব কবিতা লেখেন।

পুথিগুলো পৃথিবীতে কে না পড়ল! আর চীন রাজার হাতেও কয়েকখানা এসে পড়ল বইকি। তাঁর সোনার সিংহাসনে বসে-বসে তিনি পড়লেন, আরও পড়লেন, পড়তে পড়তে কেবলি খুশি হয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন— কেবল তাঁর রাজধানীর, তাঁর প্রাসাদের, তাঁর বাগানের এতসব উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পড়ে বড়ো ভালো লাগল তাঁর। 'কিন্তু সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কোকিল পাখি', সেখানে স্পষ্ট করে লেখা।

রাজা চমকে উঠলেন। কোকিল! সে কী জিনিস? ও-রকম কোনো পাখি আছে নাকি আমার রাজত্বে? আমার বাগানেও নাকি আছে! আমি তো কখনো শুনিনি! কী কাণ্ড, তার কথা আমি প্রথম জানলাম এসব বই পড়ে। রাজা তাঁর প্রধান অমাত্যকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এতই প্রধান যে তাঁর নিম্নস্থ কেউ যদি কখনো সাহস করে তাঁর সঙ্গে কথা বলত তিনি শুধু জবাব দিতেন : 'পি!' আর তার অবশ্য কোনো মানে হয় না।

'কোকিল বলে এক আশ্চর্য পাখি নাকি এখানে আছে', রাজা বললেন। 'এঁরা বলছেন আমার এত বড়ো রাজত্বে সেটাই শ্রেষ্ঠ জিনিস। কই, আমি তো তার কথা কখনো শুনিনি!'

প্রধান অমাত্য একটু ভেবে বললেন, 'রাজসভায় সে তো কখনো উপস্থিত হয়নি, তার তো নামই শুনিনি, মহারাজ।'

রাজা বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় সে আমার সভায় এসে গান করবে, এই আমার আদেশ। যদি সে না-আসে তাহলে আজ সান্ধ্যভোজের পর আমার সমস্ত সভাসদ হাতির নিচে পড়ে মরবে।'

'চুং-পিং!' প্রধান অমাত্য বলে উঠলেন। তারপর আবার তিনি ওঠানামা করলেন দু-শো সিঁড়ি দিয়ে, খুঁজলেন সব ঘর, সব বারান্দা, আর সভাসদরা ছুটল তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে। হাতির নিচে পড়ে মরতে কারুরই পছন্দ নয়।

শেষটায় রান্নাঘরে ছোটো একটা মেয়ের সঙ্গে তাদের দেখা, রাজার পাঁচশো রাঁধুনির জন্য পাঁচশো ঝি, সেই ঝিদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো সে। সে বলল, 'কোকিল? আমি তো রোজই শুনি তার গান— আহা, সত্যি বড়ো ভালো গায়।'

প্রধান অমাত্য গম্ভীরমুখে বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় কোকিলের রাজসভায় আসবার কথা। তুমি পারবে আমাদের তার কাছে নিয়ে যেতে? যদি পারো, এক্ষুনি তোমাকে রাঁধুনি করে দেব, তা ছাড়া মহারাজ যখন ভোজে বসবেন তুমি দরজার ধারে দাঁড়িয়ে দেখবার অনুমতি পাবে।'

তখন তারা সবাই মিলে গেল সেই বনে, কোকিল যেখানে গান গায়; গেল মন্ত্রী, সেনাপতি, উজির, নাজির, হাকিম, পেশকার।

'ওই তো!' মেয়েটি বলল। 'শুনুন আপনারা, শুনুন— ওই তো সে বসে আছে।' মেয়েটি একটা গাছের ঘন ডালের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

অনেকক্ষণ উঁকিঝুঁকি লাফঝাঁপ মেরে অনেক চেষ্টায় সবাই সেই কালো পাখিকে দেখতে পেল। প্রধান অমাত্য বলে উঠলেন, 'আরে এ আবার একটা পাখি নাকি। মরি মরি, কী রূপ!'

সমস্ত দল এই রসিকতায় হেসে উঠল।

মেয়েটি গলা চড়িয়ে বলল, 'কোকিল, শুনছ? আমাদের সম্রাট তোমার গান শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' কোকিল তক্ষুনি মহা উৎসাহে গান গাইতে আরম্ভ করল।

কোকিল ভেবেছিল সম্রাট বুঝি সেখানে উপস্থিত। প্রধান অমাত্য গম্ভীর স্বরে বললেন, 'বেশ গান তোমার, কোকিল। আজ রাজপ্রাসাদের সান্ধ্যউৎসবে তোমাকে আমি নিমন্ত্রণ করছি, সেখানে তুমি গান শুনিয়ে আমাদের সম্রাটকে মুগ্ধ করবে।'

রাজসভায় আজ উৎসব-সজ্জা।

সভার ঠিক মাঝখানে সোনার একটা ডালে হীরের পাতা বসানো, কোকিল সেখানে বসবে।

সভাসদরা বসেছেন সাজের আর অলংকারের ঝিলিক তুলে, আর সেই ছোটো মেয়েটি দরজার আড়ালে— সে এখন রাজ-রাঁধুনির পদ পেয়েছে। সবাই কোকিলের দিকে তাকিয়ে; স্বয়ং সম্রাট চোখের ইশারায় তাকে উৎসাহ দিচ্ছেন।

আর কোকিল এমন আশ্চর্য গান করল যে সম্রাটের দুই চোখ জলে ভরে উঠল, চোখ ছাপিয়ে বেয়ে পড়ল গাল দিয়ে; তখন কোকিল গাইল আরও মধুর, আরও তীব্র মধুর স্বরে, তা সোজা বুকের মধ্যে এসে লাগল। সম্রাট এত খুশি হলেন যে তিনি তাকে তাঁর একপাটি সোনার চটি গলায় পরবার জন্যে দিতে চাইলেন। কিন্তু কোকিল বলল, 'মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আর কিছু নিতে পারব না, যথেষ্ট পুরস্কার আমি পেয়েছি। আমি সম্রাটের চোখে অশ্রু দেখেছি— সেই তো আমার পরম ঐশ্বর্য। সম্রাটের অশ্রুর অদ্ভুত ক্ষমতা— এত বড়ো পুরস্কার আর কী আছে।'

তখন থেকে রাজসভাতেই তার বাসা হলো, নিজের সোনার খাঁচায়। দিনের মধ্যে দু-বার সে বেরোতে পারে, আর রাত্রে একবার। আর তার বেরোবার সময় সঙ্গে থাকে বারোজন চাকর, তাদের প্রত্যেকের হাতে পাখির পায়ের সঙ্গে বাঁধা রেশমি সুতো শক্ত করে ধরা। এ রকম বেড়ানোয় কোনো সুখ নেই, সত্যি বলতে।

একদিন রাজার নামে এল মস্ত একটা পার্সেল, তার গায়ে বড়ো-বড়ো অক্ষরে লেখা, 'কোকিল।'

'এই বিখ্যাত পাখি সম্বন্ধে নতুন একটা বই এল', রাজা বললেন।

কিন্তু বই তো নয়, বাক্সের মধ্যে ছোটো একটা জিনিস। চমৎকার কাজ করা একটা কলের কোকিল, মণি মুক্তো হীরে জহরতে ঝলোমলো, সত্যিকারের পাখির মতো তার গান। কলের পাখিটায় দম দিয়েছ কি সে অবিকল কোকিলের মতো গাইতে শুরু করবে, আর সঙ্গে সঙ্গে দুলবে তার সোনা-রুপোর কাজ-করা লেজ। গলায় তার ছোট্ট ফিতে বাঁধা, তাতে লেখা : 'জাপানের মহামহিমান্বিত সম্রাটের কোকিলের তুলনায় চীন সম্রাটের কোকিল কিছুই নয়।'

'এখন এরা দুজন একসঙ্গে গান করুক', রাজা বললেন। 'সে কী চমৎকারই হবে!'

দু-জনে একসঙ্গে গাইল, কিন্তু বেশি জমল না। কারণ কলের কোকিল গাইল বাঁধা গৎ, আর সত্যিকারের কোকিল গাইল নিজের খেয়ালে।

কোকিলবাহক বলল, 'আমাদের কোকিলের কিছু দোষ নয়; ও বাঁধা সুরে গায়— একেবারে নিখুঁত।'

তারপর কলের কোকিল একা গাইল। আসল কোকিলেরই মতো সে মুগ্ধ করল— তার ওপর সে দেখতে অনেক ভালো, বাজুবন্ধহারের মতো ঝলমল করছে।

একবার নয়, দুবার নয়, বত্রিশবার কলের কোকিল সেই একই গৎ গাইল, তবু ক্লান্ত হলো না। অমাত্যদের আবার শুনতেও আপত্তি নেই, কিন্তু সম্রাট বললেন, 'এখন জ্যান্ত কোকিল কিছু গান করুক।'

কিন্তু কোথায় সে?

কখন সে উড়ে গেছে খোলা জানালা দিয়ে, ফিরে গেছে বনের সবুজ বুকে, কেউ লক্ষ করেনি।

তারপর অবশ্য কলের কোকিলকে আবার গাইতে হলো, চৌত্রিশবারের বার একই গৎ তারা শুনল। পরের পূর্ণিমায় রাজ্যের সব প্রজাকে নিমন্ত্রণ করা হলো এই পাখি দেখতে— সংগীতবিশারদ দেখাবেন। গানও শুনতে হবে তাদের, রাজার হুকুম। গান তারা শুনল— একবার নয়, দু-বার নয়, ছত্রিশবার। এত খুশি হলো তারা গান শুনে, যেন ছত্রিশ পেয়ালা চা খেয়েছে। কেউ বলল আহা, কেউ বলল ওহো; কেউ ঘাড় নাড়ল, কেউ নাড়ল মাথা; কিন্তু সেই যে জেলে, বনের মধ্যে আসল কোকিলের গান যে শুনেছিল, সে বলল, 'মন্দ নয়, কিন্তু যতবার গাইল এক রকমই লাগল যেন। আর কী-যেন একটা নেই মনে হলো।'

কথাটা সংগীতবিশারদ শুনে ফেললেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী নেই বলো তো বাপু? তালে লয়ে সুরে মানে একেবারে নিখুঁত!'

জেলে বেচারা ঘাবড়ে চুপ করে গেল। আসল কোকিল নির্বাসিত হলো দেশ থেকে। নকল পাখিটা রইল রাজার হালে; সম্রাটের বিছানার পাশে রেশমি বালিশে সে ঘুমোয়, চারদিকে মণিমুক্তো হীরে-জহরতের সব উপঢৌকন ছড়ানো।

সংগীতবিশারদ এই নকল পাখি সম্বন্ধে পঁচিশখানা মোটা-মোটা পুথি লিখে ফেললেন— তাঁর লেখা যেমন লম্বা তেমনি গুরু-গম্ভীর, চীনে ভাষার যত শক্ত-শক্ত কথা সব আছে তাতে— তবু সবাই বলল যে তারা সবটা পড়েছে এবং পড়ে বুঝেছে, পাছে কেউ বোকা ভাবে, কি সংগীতবিশারদ চটে গিয়ে পাগলা হাতির নিচে তাদের থেঁতলে মারেন।

কাটল এক বছর এমনি করে। কলের পাখির গানের প্রতিটি ছোটো-ছোটো টান সম্রাটের মুখস্থ, তাঁর পারিষদদের মুখস্থ, প্রত্যেক চীনের মুখস্থ।

এরই মধ্যে একদিন হলো কী— কলের পাখি গেয়ে চলছে, এত ভালো সে আর কখনোই যেন গায়নি— সম্রাট শুনছেন বিছানায় শুয়ে। হঠাৎ পাখিটার ভেতরে একটা শব্দ হলো, 'গর্‌র্‌র্‌র্‌, কী যে একটা ছিঁড়ে গেল 'গঁ-গঁ— গর্‌র্‌র্‌র্‌' সবগুলো চাকা একবার ঘুরে এল, তারপর গান গেল থেমে।

সম্রাট লাফিয়ে উঠলেন, ডেকে পাঠালেন তাঁর দেহ-পুরোহিতকে (চীন সম্রাটের চিকিৎসকের তা-ই উপাধি); কিন্তু তিনি কী করবেন? তারপর ডাকা হলো ঘড়িওয়ালাকে– অনেক বলাবলি, অনেক খোঁজাখুঁজি, টুকটাক ঠুকঠাকের পর পাখিটাকে কোনোরকম মেরামত করা গেল বটে; কিন্তু আগের জিনিস আর হলো না। ঘড়িওয়ালা বলে গেল একে যেন খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করা হয়, কলকবজা গেছে খারাপ হয়ে, নতুন আর বসানো যাবে না। এরপর থেকে বছরে একবারের বেশি একে গাওয়ানো যাবে না, আর তাও না-গাওয়ালেই ভালো। রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল।

পাঁচ বছর কেটে গেল– এবার রাজ্যে সত্যিকারের হাহাকার। চীনেরা তাদের সম্রাটকে সত্যি ভালোবাসে, আর এখন শোনা যাচ্ছে সম্রাটের নাকি অসুখ, আর বেশি দিন তিনি বাঁচবেন না। এরই মধ্যে নতুন একজন সম্রাট ঠিক করা হয়ে গেছে; আর প্রজারা রাজপ্রাসাদের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রধান অমাত্যর কাছে খোঁজ নিচ্ছে রাজা কেমন আছেন।

প্রধান অমাত্য বলছে, 'পি!' আর মাথা নাড়ছেন।

মস্ত জমকালো বিছানায় সম্রাট শুয়ে আছেন– শরীর তাঁর ঠান্ডা, মুখ তাঁর ম্লান। সভাসদদের ধারণা তিনি মরে গেছেন– তাঁরা ছুটেছেন নতুন সম্রাটকে অভিনন্দন জানাতে।

কিন্তু সম্রাট মরেননি; শক্ত, নিঃসাড় হয়ে শুয়ে আছেন জমকালো বিছানায়। ঘরের জানালা খোলা, আকাশ থেকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে সম্রাটের ওপর আর তাঁর কলের পাখির ওপর।

অতি কষ্টে সম্রাটের নিশ্বাস পড়ছে, কেউ যেন চেপে বসেছে তাঁর বুকের ওপর। চোখ মেলে তিনি তাকালেন; দেখলেন তাঁর বুকের ওপর মৃত্যু বসে, তার মাথায় তাঁরই সোনার মুকুট, এক হাতে তাঁরই তরোয়াল, অন্য হাতে তাঁরই ঝকঝকে নিশান। এখন মৃত্যু কিনা তাঁর বুকের ওপর বসে!

'গান! গান!' সম্রাট বলে উঠলেন।

কিন্তু পাখিটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল– কে দেবে তাকে দম, আর দম না-দিয়ে দিলে সে গাইবেই-বা কী করে? আর হঠাৎ জানালার দিক থেকে বেজে উঠল গান, আশ্চর্য মধুর গান। এ সেই ছোট্ট কোকিল, আসল কোকিল, জানালার বাইরে গাছের ডালে বসে সে গাইছে। সে শুনেছিল সম্রাট ভালো নেই, আর তাই সে এসেছে তাঁকে শান্তি দিতে, আশা দিতে। গেয়ে চলল সে একমনে, রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠে জোরে বইল সম্রাটের দুর্বল শরীরে; এমনকি মৃত্যুও কান পেতে শুনল, তারপর বলল :

'আহা– থেমো না, বাছা, থেমো না!'

'তবে আমাকে দাও ওই ঝকঝকে সোনালি তরোয়াল, দাও ওই চোখ-ঝলসানো নিশান, দাও ওই সম্রাটের মুকুট।'

আর মৃত্যু একে-একে সব ঐশ্বর্যই দিয়ে দিল, গান শুনবে বলে। কোকিলের গান আর থামে না।

রাজা বলে উঠলেন, 'ধন্য কোকিল, তুমি ধন্য! ওরে দেবতার দূত স্বর্গের পাখি, তোকে তো আমি চিনি! তোকেই না আমি আমার রাজত্ব থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম! তবু তুই-ই তো আজ তাড়িয়ে দিলি মৃত্যুকে আমার হৃদয় থেকে! কী পুরস্কার চাস তুই বল।'

কোকিল বলল, 'আমি, তো পেয়েছি আমার পুরস্কার। মহারাজ, প্রথম যেদিন আমি আপনার সামনে গান করি, আপনার চোখে জল এসেছিল। তা আমি কখনো ভুলব না। যে গান গায়, ওর বেশি আর কোন মণিমুক্তো চায় সে? এখন আপনি ঘুমোন, মহারাজ, সুস্থ সবল হয়ে উঠুন, আর আমি আপনাকে গান শোনাই।'

গাইল কোকিল, শুনতে শুনতে সম্রাট ঘুমিয়ে পড়লেন। সে-ঘুম মুছিয়ে দিল তাঁর সকল রোগ, সকল ক্লান্তি। সকালবেলার আলো জানালা দিয়ে তাঁর মুখের ওপর এসে পড়ল; তিনি জেগে উঠলেন– নতুন স্বাস্থ্য, নতুন উৎসাহ নিয়ে। অমাত্য কি ভৃত্য কেউ তখনও আসেনি, সবাই জানে তিনি আর বেঁচে নেই। কেবল কোকিল তখনও গান করছে তাঁর পাশে বসে।

'তুমি সবসময় থাকবে আমার সঙ্গে– থাকবে তো?' সম্রাট বললেন। 'তোমার যেমন খুশি গান করবে তুমি। কলের পুতুলটাকে হাজার টুকরো করে আমি ভেঙে ফেলব।'

কোকিল বলল, 'মহারাজ, মিছিমিছি ওর ওপর রাগ করছেন। যতখানি ওর সাধ্য ও করেছে; এতদিন ওকে রেখেছেন, এখনও রাখুন। আমি তো রাজপ্রাসাদে বাসা বেঁধে থাকতে পারব না; অনুমতি করুন, যখন ইচ্ছে করবে আমি আসব, এসে সন্ধেবেলায় জানালার ধারে ওই ডালের ওপর বসে গান শোনাব আপনাকে– সে গান শুনে অনেক কথা আপনার মনে পড়বে। যারা সুখী তাদের গান গাইব, যারা দুঃখী তাদের গান গাইব; গাইব চারদিকে লুকোনো ভালো-মন্দের গান। আপনার এই ছোটো পাখিটি অনেক দূরে-দূরে ঘুরে বেড়ায়, গরিব জেলের ঘরে, চাষিদের খেতে– আপনার সভার ঐশ্বর্য থেকে অনেক দূরে যারা থাকে, যায় তাদের কাছে, জানে তাদের কথা। আপনাকে আমি গান শোনাব এসে; কিন্তু মহারাজ, একটি কথা আমাকে দিতে হবে।'

'যা চাও! যা কিছু চাও তুমি!' সম্রাট নিজের হাতেই তাঁর রাজবেশ পরে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর সোনার তরোয়াল চেপে ধরলেন বুকের ওপর।

'এই মিনতি আমার, ছোটো একটা পাখি এসে আপনাকে সব কথা বলে যায় এ-কথা কাউকে বলবেন না। তাহলেই সব ভালো রকম চলবে।'

এল ভৃত্য, এল অমাত্য মৃত সম্রাটকে দেখতে। এ কী! ওই তো তিনি দাঁড়িয়ে! সম্রাট তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসো'।

লেখক-পরিচিতি

হান্স ক্রিশ্চিয়ান আন্দেরসেনের জন্ম ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে ডেনমার্কের আদেনস শহরে। বাবা ছিলেন জুতার কারিগর ও নেহাত গরিব লোক। নানা বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে সাহিত্যিক হিসেবে আন্দেরসেন লাভ করেন জগৎজোড়া খ্যাতি। তিনি নাটক, ভ্রমণকাহিনি ও উপন্যাস লিখলেও সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পেয়েছেন গল্প লিখে। আন্দেরসেনকে বলা হয় গল্পের জাদুকর। কল্পনা ও বাস্তবের মিশেলে রচিত হয়েছে এসব গল্পকথা। এতে মানবিক অনুভূতি গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর রূপকথাগুলো ১২৫টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় আন্দেরসেনের অনেক গল্প অনূদিত হয়েছে। 'মৎস্যকন্যা', 'কুচ্ছিত প্যাঁকারু', 'বুনো হাঁসদের কথা' 'নাইটিঙ্গেল', 'রাজার নতুন পোশাক' প্রভৃতি গল্প ঘরে ঘরে পরিচিত ও জনপ্রিয়। আন্দেরসেন ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে কোপেনহেগেনে মৃত্যুবরণ করেন।

অনুবাদক-পরিচিতি

বুদ্ধদেব বসু ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, অনুবাদক ও সম্পাদক ছিলেন। 'প্রগতি' ও 'কবিতা' পত্রিকা সম্পাদনা করে বিশেষ খ্যাতি পান। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে– 'বন্দীর বন্দনা', 'কঙ্কাবতী', ইত্যাদি কাব্য। 'তিথিডোর', 'নির্জন স্বাক্ষর', 'রাত ভ'রে বৃষ্টি' ইত্যাদি উপন্যাস। মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' তাঁর অনুবাদ-গ্রন্থ। বুদ্ধদেব বসু ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

এটি একটি রূপকথাধর্মী গল্প। চীনদেশে ছিল এক ছোট্ট ও সুকণ্ঠী কোকিল। একদিন রাজদরবারে ডাক পড়ল তার । রাজা কোকিলের গানে মুগ্ধ হয়ে তাকে রেখে দিলেন রাজসভাতেই, সোনার খাঁচায় পুরে। এবার তার প্রতিদ্বন্দ্বী হলো এক কলের কোকিল। গৎবাঁধা তার কণ্ঠ ও সুর। তবু সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কলের কোকিলের প্রশংসায় অবহেলিত আসল কোকিল একদিন রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করল। এরই মধ্যে কলের কোকিলের তার ছিঁড়ে গেল। তাকে মেরামত করা হলো বটে, তবে আগের মতো আর টানা বাজে না। রাজ্যে পড়ে গেল হাহাকার। রাজাও হলেন বেজায় অসুস্থ, পড়ে রইলেন বিছানায় নিথর। কিন্তু রাজা মারা যাননি, তবে মৃত্যুভীতি তাঁর বুকে চেপে বসেছে। আর মুমূর্ষু রাজা কলের কোকিলের উদ্দেশে বলছেন, গান গাও, গান! কিন্তু কলের কোকিল চুপ, কণ্ঠে তার গান নেই। ঠিক সে সময় জানালার বাইরে গান গেয়ে উঠল ছোট্ট সেই কোকিল, অপূর্ব সে সুর। গান তার আর থামে না। রাজ্যের এই দুর্দিনে রাজার প্রাণ রক্ষা করতে সে এসেছে ফিরে। সারারাত মধুর গান গেয়ে রাজাকে ঘুম পাড়াল কোকিল। সকালে রাজা জেগে উঠলেন– পেলেন নতুন জীবন, নতুন উৎসাহ। বিনিময়ে কোকিল কিছুই নিল না কৃতজ্ঞ রাজার কাছ থেকে। শুধু স্বাধীনভাবে রাজা, প্রজা, জেলে, চাষি সকলের জন্য দুঃখ-সুখের গান গাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করল আর সবার অগোচরে রাজাকে জানাতে চাইল রাজ্যের সত্যিকার সকল খবর।

আসলে যে সত্যিকার উপকারী, সে কিছু পাওয়ার আশায় উপকার করে না। অন্যদিকে যন্ত্রের চাকচিক্য সবসময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিকল্প হয় না। গল্পটিতে এসব সত্যের প্রকাশ ঘটেছে।

শব্দার্থ ও টীকা

চীনেম্যান	– চীনদেশীয় লোক।
হ্রদ	– চারদিকে স্থল দিয়ে ঘেরা জলাশয়।
অতল	– যার তল নেই।
রাজধানী	– দেশশাসনের কেন্দ্র, যেখানে প্রধান প্রধান সরকারি অফিস থাকে।
প্রাসাদ	– ইমারত, বাড়ি।
অমাত্য	– আমলা, মন্ত্রী। রাজকর্মে মন্ত্রণাদাতা ব্যক্তি।
নিম্নস্থ	– নিচের।
সান্ধ্যভোজ	– সন্ধ্যাকালের খাবারের আয়োজন।
সভাসদ	– সভায় যোগদানকারী ব্যক্তি। দরবারের লোক। রাজ-আমলা বা মন্ত্রী।

উজির	— মন্ত্রী।
নাজির	— আদালতের কর্মচারী, যিনি পেয়াদাদের দেখাশোনা করেন।
পেশকার	— আদালতের কর্মচারী, যিনি বিচারকের কাছে কাগজপত্র উপস্থাপন করেন।
রাজ-রাঁধুনি	— উপাধি বিশেষ। রাজকীয় রান্নার কাজে নিযুক্ত প্রধান পাচক।
পার্সেল	— মোড়ক বা প্যাকেট।
স্বয়ং	— নিজে, আপনি।
সোনার চটি	— সোনার তৈরি পাতলা স্যান্ডেল বিশেষ।
ঐশ্বর্য	— সম্পদ।
মহামহিমান্বিত	— অতিশয় গৌরবান্বিত।
কোকিলবাহক	— কোকিল বহনকারী। যে কোকিলকে বহন করে।
বাজুবন্ধহার	— একধরনের অলংকার। বাহুতে পরার অলংকার বিশেষ।
গৎ	— গানের নির্ধারিত বা বাঁধা সুর।
সংগীতবিশারদ	— সংগীতজ্ঞ। গান-বাজনা বা বাদ্যযন্ত্রের সুর, তাল, লয়, ধ্বনি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান রাখেন যিনি।
নির্বাসিত	— নিজের দেশ থেকে বহিষ্কৃত।
উপঢৌকন	— উপহার।
পারিষদ	— সদস্য, সভ্য, সভাসদ।
কলকব্জা	— যন্ত্রপাতি।
নিঃসাড়	— অচেতন।
নিশান	— পতাকা।